যখন তোমাদের পালনকর্তা (আমার মাধ্যমে) ঘোষণা করে দেন যে, যদি (আমার নিয়ামত-সমূহ শুনে) তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদেরকে (হয় দুনিয়াতেও, না হয় পরকালে তো অবশ্যই) অধিক নিয়ামত দেব এবং যদি তোমরা (এসব নিয়ামত শুনে) অকৃতজ্ঞ হও, তবে (মনে রেখ,) আমার শাস্তি খুবই ভয়ঙ্কর। (অকৃতজ্ঞতা করলে এর সম্ভাবনা আছে।) এবং মূসা (আরও) বলেন ঃ যদি তোমরা এবং সারা বিশ্বের সব মানুষ একত্রিত হয়েও অকৃতজ্ঞতা কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা (-র কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তিনি) সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী (এবং স্বীয় সত্তায়) প্রশংসার যোগ্য। (সেখানে অপরের দ্বারা পূর্ণতা অর্জনের সম্ভাবনাই নেই। তাই আল্লাহ্র ক্ষতি কল্পনাই করা যায় না। পক্ষান্তরে তোমরা তো إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ বাক্যে নিজেদের ক্ষতির কথা শুনলে। তাই কৃতজ্ঞ হও--- অকৃতজ্ঞ হয়ো না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি মূসা (আ)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহ্র অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

اٰيَات —আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে ; কারণ, সেগুলো নাযিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ন'টি মু'জিযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তন্মধ্যে লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হয়ে যাও-য়ার কথা কোরআনের একাধিক জায়গায় উল্লিখিত আছে। এ অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, মূসা (আ)-কে সুস্পষ্ট মু'জিযা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো দেখার পর কোন ভদ্র ও সমঝদার ব্যক্তি অস্বীকার ও অবাধ্যতায় কায়েম থাকতে পারে না।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে ناس (মানবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ —এতে ইঙ্গিত আছে যে, মূসা (আ) শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য!

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করান।

আইয়ামুল্লাহ ঃ ايام শব্দটি يوم-এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। ايام الله শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ্' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এই সব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুঁশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহ্র অপর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোন কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র আয়াত শুনিয়ে অথবা মু'জিযা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। এক. শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং দুই. নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহবান করা। وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ বাক্যে এ দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণাম, তাদের আযাব, জিহাদে তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করান যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনি-ভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ্র যেসব নিয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য ও তওহীদের দিকে আহবান করুন; উদাহরণত তীহ্ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ—এখানে آيات-এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। صبار শব্দটি صبر থেকে صيغة مبالغة-এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবর-কারী। شكور শব্দটি شكر থেকে صيغة مبالغة-এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতেই অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহ্র অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান আছে ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোকরকারী।

উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সকল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি যদিও প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হিদায়তের জন্য ; কিন্তু হতভাগ্য কাফিররা চিন্তাই করে না, তারা এগুলো থেকে কোন উপকারই লাভ করে না। উপকার তারাই লাভ করে, যারা সবর ও শোকর উভয় গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ মু'মিন। কেননা, বায়হাকী হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত। এর অর্ধাংশ সব‍র এবং অর্ধাংশ শোকর।---(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সবর ঈমানের অর্ধেক। সহীহ্ মুসলিম ও মসনদে আহ্মদে হযরত সোহায়ব (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, মু'মিনের প্রত্যেক অবস্থাই সর্বোত্তম ও মহত্তম। এ বিষয়টি মু'মিন ছাড়া আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। কারণ, মু'মিন কোন সুখ, নিয়ামত অথবা সম্মান পেলে তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। (ইহকালে তো আল্লাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী নিয়ামত আরও বেড়ে যায় এবং অব্যাহত থাকে, পরকালে সে এ কৃতজ্ঞতার বিরাট প্রতিদান পায়।) পক্ষান্তরে মু'মিনের কষ্ট অথবা বিপদ হলে সে তজ্জন্য সবর করে। সবরের কারণে তার বিপদও তার জন্য নিয়ামত ও সুখ হয়ে যায়। (ইহকালে এভাবে যে, সবরকারীরা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গলাভে সমর্থ হয়। কোরআন বলে ঃ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা যার সঙ্গে থাকেন, পরিণামে তার মুছিবত আরামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরকালে এভাবে যে, আল্লাহ্র কাছে সবরের বিরাট প্রতিদান অগণিত রয়েছে। কোরআন বলে ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

মোটকথা, মু'মিনের কোন অবস্থা মন্দ হয় না ---সর্বোত্তম হয়ে থাকে। সে পতিত হয়েও উত্থিত হয় এবং নষ্ট হয়েও গঠিত হয়।

نہ شوخی چل سکی باد صبا کی
بگڑنے میں بھی زلف اسکی بنا کی

ঈমান এমন একটি অনন্য সম্পদ যা বিপদ ও কষ্টকেও নিয়ামত ও সুখে রূপান্তরিত করে দেয়। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে বললেন, আমি আপনার পর এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করব, যদি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে তারা একে সওয়াবের উপায় মনে করে সবর করবে। এ বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানবুদ্ধি ও সহ্যগুণের ফলশ্রুতি নয় বরং আমি তাদেরকে স্বীয় জ্ঞান ও সহনশীলতার একটি অংশ দান করব।---(মাযহারী)

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহ্র রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয় আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য মূসা (আ)-কে আদেশ দেওয়া হয়ঃ

মূসা (আ)-এর পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের ছেলে-সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যা-সন্তানদেরকে খিদমতের জন্য লালন-পালন করা হত। মূসা (আ)-কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তিদান করেন।

কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ○

تَاَذَّنَ ---শব্দটির অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এইঃ এ কথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর অর্থাৎ সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে আমি এসব নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীক প্রাপ্ত হয়, যে কোন সময় নিয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। --(মাযহারী)

আল্লাহ্ আরও বলেনঃ যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ্র নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতার এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেও নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যে, যেন নিয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আযাবে গ্রেফতার হতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞদের জন্য প্রতিদান, সওয়াব ও নিয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন لَاَزِيْدَنَّكُمْ কিন্তু এর

বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্য তাকিদ সহকারে لَأُعَذِّبَنَّكُمْ (আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেব)। বলেননি; বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন এতে ঈঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আযাবে পতিত হবে---এটা জরুরী নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

---অর্থাৎ মূসা (আ) স্বজাতিকে বললেন ঃ যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে স্মরণ রেখ, এতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তার প্রশংসনীয় তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য যে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশত তোমাদেরই উপকার করার জন্য।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ

لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ
بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ وَمَا لَنَآ
اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۭ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰي مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۭ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ ذٰلِكَ
لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ۝ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ
جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝

(৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নূহ, আদ ও সামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌঁছেনি ? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে ঃ যা কিছু সহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। (১০) তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা ? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন যাতে তোমাদের কিছু গোনাহ্ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত ঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। (১১) তাদের পয়গম্বর তাদেরকে বলেন ঃ আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয় ; ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপর ভরসা করা চাই। (১২) আমাদের আল্লাহ্র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্য আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে

ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিম-দেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৫) পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মক্কার কাফিররা) তোমাদের কাছে কি ঐসব লোকের (ঘটনাবলীর) খবর (সংক্ষেপে হলেও) পৌঁছেনি, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল? অর্থাৎ কওমে-নূহ, আদ, (কওমে হূদ,) সামূদ, (কওমে সালেহ্) এবং যারা তাদের পরে হয়েছে, যাদের (বিস্তা-রিত অবস্থা) আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না? (কারণ, তাদের তথ্যাদি ও বিবরণ লিপিবদ্ধ ও বর্ণিত হয়নি। তাদের ঘটনাবলী এই ঃ) তাদের পয়গম্বর তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা (কাফিররা) আপন হাত পয়গম্বরগণের মুখে দিয়েছিল (অর্থাৎ মেনে নেওয়া দূরের কথা, তারা চেষ্টা করত, যাতে পয়গম্বরগণ কথা পর্যন্ত বলতে না পারে)। এবং বলল ঃ যে নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তওহীদ ও ঈমান), আমরা তা মানি না এবং যে বিষয়ের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও (অর্থাৎ সেই তওহীদ ও ঈমান,) আমরা সে বিষয়ে বিরাট সন্দেহে আছি, যা (আমাদেরকে) উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। (এর উদ্দেশ্য তওহীদ ও রিসালত উভয়টি অস্বীকার করা। তওহীদের অস্বীকার বর্ণনা সাপেক্ষ নয় এবং রিসালতের অস্বীকার تَدْعُوْنَنَا শব্দের মধ্যে নিহিত আছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও প্রেরিত নও)। তাদের পয়গম্বর (এর উত্তরে) বললেন ঃ (তোমরা) কি আল্লাহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ সম্পর্কে) সন্দেহ (ও অস্বীকার) করছ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা? (অর্থাৎ এগুলো সৃষ্টি করা স্বয়ং তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ। এহেন প্রমাণের উপস্থিতিতে সন্দেহ করা আশ্চর্যের বিষয় বটে! তোমরা সে তওহীদের দাওয়াতকে পৃথকভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করছ, এটাও নিতান্ত ভুল। যদিও তওহীদের বিষয়বস্তুটি ন্যায়ানুগ হওয়ার কারণে কেউ যদি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে এর দাওয়াত দেয়, তবুও শোভনীয়। কিন্তু বিতর্কিত ক্ষেত্রে তো আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে দাওয়াত দিচ্ছি। অতএব) তিনি (ই) তোমাদেরকে (তওহীদের দিকে) দাওয়াত দিচ্ছেন, যাতে (তা কবুল করার বরকতে) তোমাদের (অতীত) গোনাহ্সমূহ মাফ করে দেন এবং (তোমাদের বয়সের) নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে (সুষ্ঠুভাবে) আয়াত দান করেন। (উদ্দেশ্য এই যে, তওহীদ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সত্য হওয়া ছাড়াও তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে উপকারীও। এই জওয়াবে উভয় বিষয়ের জওয়াব হয়ে গেছে। أَفِي اللَّهِ شَكٌّ এ তওহীদ সম্পর্কে

এবং يَدْعُونَكُمْ এ রিসালত সম্পর্কেও।) তারা (অতঃপর উভয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল এবং) বলল ঃ তোমরা (পয়গম্বর নও ; বরং) নিছক মানব, যেমন আমরা। (মানবতা রিসালতের পরিপন্থী। তোমরা যা বল, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়; বরং) তোমরা (নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতেই) চাও যে, আমাদের পিতৃপুরুষ যে বস্তুর ইবাদত করত, (অর্থাৎ প্রতিমা) তা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখ। অতএব (যদি রিসালতের দাবীদার হও, তবে উল্লিখিত প্রমাণাদি ছাড়া অন্য) কোন সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখাও (যা অধিকতর সুস্পষ্ট। এতে নবুয়তের তর্ক বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। আর يَعْبُدُ آبَاؤُنَا বাক্যে তওহীদের তর্কের দিকে ইঙ্গিত আছে। যার সারমর্ম এই যে, শিরক যে সত্য, তার প্রমাণ---ইহা আমাদের, বাপদাদার কাজ) তাদের পয়গম্বর (এর উত্তরে) বললেন ঃ (তোমাদের বক্তব্য কয়েক ভাগে বিভক্ত ঃ তওহীদ অস্বীকার, প্রমাণ---বাপদাদার কাজ। নবুয়ত অস্বীকার, পূর্ববর্তী প্রমাণাদি ছাড়া সুস্পষ্ট মু'জিযার দাবী। প্রথমোক্ত বিষয় সম্পর্কে فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এ উত্তর হয়ে গেছে। কেননা, যুক্তির সামনে প্রথা ও প্রচলন কোন কিছু নয়। দ্বিতীয় ব্যাপারে আমরা নিজেদের মানবত্ব স্বীকার করি যে, বাস্তবিকই) আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু (মানুষ হওয়া ও নবী হওয়ার মধ্যে বৈরিতা নেই। কেননা, নবুয়ত হচ্ছে একটি উচ্চস্তরের আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং) আল্লাহ্‌ (স্বেচ্ছাধীন) বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা, (এ) অনুগ্রহ করবেন (অনুগ্রহ বিশেষ করে অমানবের প্রতি হবে---এর কোন প্রমাণ নেই।) এবং (তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে কথা এই যে, নবুয়তের দাবীসহ যে কোন দাবীর জন্য যে কোন যুক্তি এবং নবুয়তের দাবী হলে যে কোন প্রমাণ অবশ্যই দরকার। এগুলো পেশ করা হয়ে গেছে। এখন রইল বিশেষ যুক্তি ও বিশেষ মু'জিযার কথা, যাকে তোমরা সুলতানে-মুবীন অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে ব্যক্ত করছ। এ সম্পর্কে কথা এই যে, প্রথমত এটা তর্কশাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী জরুরী নয়। দ্বিতীয়ত) এটা আমাদের আয়ত্তাধীন বিষয় নয় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া আমরা তোমাদেরকে কোন মু'জিযা দেখাই। (সুতরাং তোমাদের সব সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। এরপরও যদি তোমরা না মান এবং বিরোধিতা করে যাও, তবে কর। আমরা তোমাদের বিরোধিতাকে ভয় করি না ; বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি।) এবং আল্লাহ্‌র উপরই সব মু'মিনের ভরসা করি উচিত। (আমরাও ঈমানদার। ঈমানের দাবী হচ্ছে ভরসা করা। তাই আমরাও ভরসা করি।) এবং আমাদের আল্লাহ্‌র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে? অথচ তিনি (আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করেছেন যে) আমাদেরকে আমাদের (ইহ-পরকালের লাভের) পথ বলে দিয়েছেন। (যার এত বড় মেহেরবানী, তার উপর তো অবশ্যই ভরসা করা উচিত।) এবং (বাইরের ক্ষতি থেকে তো আমরা এভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি, এখন রইল আভ্যন্তরীণ ক্ষতি অর্থাৎ তোমাদের বিরোধিতার চিন্তা-ভাবনা। অতএব) তোমরা (হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণ করে)

আমাদেরকে যেসব পীড়ন করেছ, আমরা তজ্জন্য সব করব। (সুতরাং এর কারণেও আমাদের ক্ষতি রইল না। এ সবরের সারমর্মও সেই ভরসা।) এবং ভরসাকারীদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। এবং (এসব প্রমাণাদি সম্পন্ন করার পরও কাফিররা নরম হল না; বরং) কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব, না হয় তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। (ফিরে আসা বলার কারণ এই যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে চুপ থাকার কারণে তারাও বুঝতো যে, তাদের ধর্মবিশ্বাসও আমাদের মতই হবে।) তখন পয়গম্বরগণের প্রতি তাদের পালনকর্তা (সান্ত্বনার জন্য) ওহী প্রেরণ করলেন যে, (এ বেচারীরা তোমাদেরকে কি বের করবে) আমি (ই) জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব এবং তাদের (ধ্বংস করার) পর তোমাদেরকে এ দেশে আবাদ করব। (এবং) এটা (অর্থাৎ আবাদ করার ওয়াদা বিশেষ করে তোমাদের জন্যই নয়; বরং) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য (ব্যাপক), যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আমার শাস্তির সতর্কবাণীকে ভয় করে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমান। এর আলামত হচ্ছে কিয়ামতকে ও শাস্তির সতর্কবাণীকে ভয় করা। শাস্তির কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার এ ওয়াদা সবার জন্য ব্যাপক।) এবং (পয়গম্বরগণ এ বিষয়বস্তু কাফিরদেরকে শোনালেন যে, তোমরা যুক্তির মীমাংসা অমান্য করেছ। এখন আযাবের মীমাংসা আগত প্রায় অর্থাৎ আযাব আসবে। তখন) কাফিররা (যেহেতু চরম মূর্খতা ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত ছিল, তাই এতেও ভয় পেল না; বরং পুরাপুরি নির্ভয়ে সেই) মীমাংসা চাইতে লাগল (যেমন فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ও ইত্যাকার আয়াত থেকে জানা যায়।) এবং (যেমন সেই মীমাংসা আসল, তখন) যত অবাধ্য ও হঠকারী ছিল, সবাই (এ মীমাংসায়) বিফল মনোরথ হল (অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে গেল। তারা নিজেদেরকে সত্যপন্থী মনে করে বিজয় ও সাফল্য কামনা করত। তাতে এ মনস্কাম অপূর্ণ রয়ে গেল।)

مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

(১৬) তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। (১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে অবাধ্য হঠকারীর কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, পার্থিব শাস্তি ছাড়া) তার সামনে

দোযখ (এর শাস্তি) রয়েছে। এবং তাকে (দোযখে) এমন পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা পুঁজরক্ত (এর অনুরূপ) হবে---যা (দারুণ পিপাসার কারণে) ঢোক গিলে গিলে পান করবে এবং (অত্যন্ত গরম ও বিস্বাদ হওয়ার কারণে) গলার ভিতরে সহজে প্রবেশ করার উপায় থাকবে না এবং প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে কিছুতেই মরবে না ; (এবং এমনিভাবে কাতরাতে থাকবে।) এবং (এ শাস্তি এক অবস্থা-তেই থাকবে না ; বরং) তাকে আরও (অধিক) কঠোর আযাবের সম্মুখীন (সব সময়) হতে হবে। (ফলে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

(كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ
فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى
اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ
قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا
لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ
وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ
مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا
أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا
أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

---

(১৮) যারা স্বীয় পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধূলিঝড়ের দিন। তাদের

উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা; (১৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন। (২০) এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। (২১) সবাই আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে ঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম---অতএব তোমরা আল্লাহ্র আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি---সবই আমাদের জন্য সমান ---আমাদের রেহাই নেই। যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করোনা এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালিম তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি কাফিরদের ধারণা হয় যে, তাদের ক্রিয়াকর্ম তাদের জন্য উপকারী হবে, তবে এ সম্পর্কে সামগ্রিক নীতি শুনে নাও যে) যারা পালনকর্তার সাথে কুফরী করে, কর্মের দিক দিয়ে তাদের অবস্থা এই, (অর্থাৎ তাদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত এমন) যেমন ছাই ভস্ম, (উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই হালকা) যাকে ধূলিঝড়ের দিন প্রবল বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। (এমতাবস্থায় ছাই ভস্মের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না, এমনিভাবে) তারা যা কিছু কর্ম করে, তার কোন অংশ (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াও উপকারের দিক থেকে) তাদের অর্জিত হবেনা। (ছাইভস্মের মত বিফলে যাবে।) এটাও অনেক দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। (ধারণা তো এরূপ যে, আমাদের ক্রিয়াকর্ম সৎ ও উপকারী কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ পায় অসৎ ও ক্ষতিকর---যেমন, মূর্তিপূজা অথবা অনুপকারী, যেমন ঃ ক্রীতদাস মুক্ত করা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। যেহেতু তাদের কর্ম সত্য থেকে অনেক দূরে, তাই একে দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা বা ঘোরতর বিভ্রান্তি বলা হয়েছে। সুতরাং এপথে মুক্তি পাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে যদি তাদের ধারণা হয় যে, কিয়ামতের অস্তিত্বই অসম্ভব বলে আযাবের সম্ভাবনা নেই। তবে এর জওয়াব এই যে,) তুমি কি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) এ কথা জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাবিধি (অর্থাৎ উপকারিতা ও উপযোগিতার সমন্বয়ে) সৃষ্টি করেছেন (এবং এতে বোঝা যায় যে, তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং) তিনি যদি চান, তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন এবং অন্য নতুন সৃষ্টজীব আনয়ন করবেন এবং এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

(সুতরাং নতুন সৃষ্টজীব আনয়ন করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন?) এবং (যদি এরূপ ধারণা হয় যে, তোমাদের বড়রা তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নেবে, তবে এর স্বরূপ শুনে নাও যে, কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র সামনে সবাই উপস্থাপিত হবে। অতঃপর নিম্নস্তরের লোক (অর্থাৎ জনসাধারণ তথা অনুসারীরা) উচ্চস্তরের লোকদেরকে (অর্থাৎ বিশিষ্ট ও অনুসৃতদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার ছলে) বলবে ঃ আমরা (পৃথিবীতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এমনকি ধর্মের যে পথ তোমরা আমাদেরকে বলে-ছিলে, আমরা সে পথেরই অনুগামী হয়েছিলাম। (আজ আমরা বিপদে আছি।) অতএব তোমরা কি আল্লাহ্‌র আযাবের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পার? (অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাঁচাতে না পারলেও কিয়ৎ পরিমাণেও বাঁচাতে পার কি?) তারা (উত্তরে) বলবে ঃ (আমরা তোমাদেরকে বাঁচাব কি, স্বয়ং নিজেরাই তো বাঁচতে পারি না। তবে) যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে (কোন) পথ (আত্মরক্ষার্থে) বলতেন, তবে আমরা তোমাদেরকেও (সেই) পথ বলে দিতাম (এবং) এখন তো আমাদের সবার পক্ষে সমান---আমরা অস্থির হই (যেমন তোমাদের অস্থিরতা فهل انتم سغنون থেকে প্রকাশ পাচ্ছে এবং আমাদের অস্থিরতা لو هدا نا الله থেকে বোঝাই যাচ্ছে।) অথবা আত্মসংবরণ করি। (উভয় অবস্থাতেই) আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। (সুতরাং এই প্রশ্নোত্তর থেকে জানা গেল যে, কুফরের পথের বড়রাও তাদের অনুসারীদের কোন কাজে আসবে না। মুক্তির এ সম্ভাব্য পথটিও ভণ্ডুল হয়ে গেল। এবং যদি এরূপ ভরসা হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্যেরা উপকার করবে, তবে এর অবস্থা এই কাহিনী থেকে জানা যাবে যে,) যখন (কিয়ামতে) সব মোকদ্দমার ফয়সালা সমাপ্ত হবে (অর্থাৎ ঈমানদাররা জান্নাতে এবং কাফিররা দোযখে প্রেরিত হবে তখন দোযখীরা সবাই সেখানে অবস্থানকারী শয়তানের কাছে গিয়ে তিরস্কার করবে যে, হতভাগা, তুমি তো ডুবলেই, আমাদেরকেও নিজের সাথে ডুবালে।) তখন শয়তান (উত্তরে) বলবে ঃ (তোমরা আমাকে অন্যায় তিরস্কার করছ। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে (যত ওয়াদা করেছিলেন, সব) সত্য ওয়াদা করেছিলেন (যে, কিয়ামত হবে, কুফুরীর কারণে ধ্বংস অনিবার্য এবং ঈমানের দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে) এবং আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম (যে, কিয়ামত হবে না এবং তোমাদের কুফরীর পথও মুক্তির পথ) অতএব আমি সেসব ভুয়া ওয়াদা তোমাদের সাথে করেছিলাম। (এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা যে সত্য এবং আমার ওয়াদা যে মিথ্যা---এর ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও তোমরা আমার ওয়াদাকে সত্য এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করেছ। অতএব তোমরা নিজে নিজেই ডুবেছ। এবং যদি তোমরা বল যে, সত্য ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করা এবং মিথ্যা ওয়াদাকে সত্য মনে করার কারণও তো আমিই ছিলাম, তবে কথা এই যে, বাস্তবিকই আমি কুমন্ত্রণাদানের পর্যায়ে কারণ ছিলাম, কিন্তু এটাও তো দেখবে যে, আমার কুমন্ত্রণা দানের পর তোমরা স্বেচ্ছাধীন ছিলে, না অক্ষম ও অপারক? অতএব বলাই বাহুল্য যে,) তোমাদের উপর আমার এ ছাড়া অন্য কোন জোর ছিল না যে, আমি তোমাদেরকে (পথভ্রষ্টতার দিকে) ডেকেছিলাম, অতঃপর তোমরা (স্বেচ্ছায়) আমার কথা মেনে নিয়েছিলে। (যদি না মানতে, তবে আমি বলপূর্বক তোমাদেরকে

পথভ্রষ্ট করতে পারতাম না। যখন এটা প্রমাণিত) অতএব আমাকে (সম্পূর্ণ) ভৎর্সনা কর না (অর্থাৎ নিজেদেরকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত মনে করে আমাকে সামগ্রিক পর্যায়ে দোষী মনে করো না।) এবং (বেশী) ভৎর্সনা নিজেদেরকেই কর। (কারণ আযাবের আসল হোতা তোমরাই। আমার কাজ তো নিরেট কারণ, যা দূরবর্তী এবং তোমাদের পথভ্রষ্টতাকে অপরিহার্য করে না। এ হচ্ছে ভৎর্সনার জওয়াব। পক্ষান্তরে তোমাদের কথার উদ্দেশ্য যদি সাহায্য প্রার্থনা হয় ; তবে আমি অন্যের সাহায্য কিভাবে করতে পারি, যখন নিজেই বিপদগ্রস্ত এবং সাহায্য প্রত্যাশী হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি যে, কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। নতুবা আমিও তোমাদের কাছে নিজের জন্য সাহায্য প্রত্যাশা করতাম। কেননা, তোমাদের সাথেই আমার সম্পর্ক বেশী। সুতরাং এখন তো) না আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী (হতে পারি) এবং না তোমরা আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী (হতে পার। তবে আমি যদি তোমাদের শিরককে সত্য মনে করতাম, তবুও এ সম্পর্কের কারণে সাহায্য প্রার্থনার অবকাশ থাকত, কিন্তু) আমি স্বয়ং তোমাদের এ কর্মে অবিশ্বাসী (এবং একে মিথ্যা মনে করি) যে, তোমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক সাব্যস্ত করতে। (অর্থাৎ মূর্তি ইত্যাদির পূজার ব্যাপারে আমার এমন আনুগত্য করতে, যে আনুগত্য বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। সুতরাং মূর্তিদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা এর অর্থ শয়তানকে শরীক সাব্যস্ত করা। অতএব আমাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করারও কোন অধিকার নেই।) নিশ্চয় জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (অতএব আযাবে পড়ে থাক। আমাকে ভৎর্সনা করে এবং আমার কাছে সাহায্য চেয়ে কোন উপকারের আশা করো না। তোমরা যে জুলুম করেছ, তা তোমরাই ভোগ কর। আমি যা করেছি, তা আমি ভোগ করব। তাই এসব কথাবার্তার এখন আর কোন অর্থ হয় না। এ হচ্ছে ইবলীসের উত্তরের সারমর্ম। এতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্যদের ভরসাও ছিন্ন হয়েছে। কেননা, ইবলীসই হচ্ছে অন্য উপাস্যদের উপাসনার আসল প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা এবং প্রকৃতপক্ষে এ উপাসনা দ্বারা সে-ই অধিক সন্তুষ্ট হয়। এ কারণেই কিয়ামতের দিন দোযখীরা তার সাথেই কথাবার্তা বলবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে কিছুই বলবে না। যখন সে পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দিল, তখন অন্যদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়। সুতরাং কাফিরদের মুক্তির সব পথই রুদ্ধ হয়ে গেল। এ বিষয়বস্তুটিই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল।)

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾

(২৩) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। যেখানে তাদের সম্ভাষণ হবে সালাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তারা এমন উদ্যানে প্রবিষ্ট হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে (এবং) তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। সেখানে তাদেরকে (আস্‌সালামু আলাইকুম বলে) সালাম করা হবে। (অর্থাৎ পরস্পরেও এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ আরও বলেন ঃ اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا

عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ الاية

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ
رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

(২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন ঃ ---পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। (২৫) সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন---যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কি জানা নেই (অর্থাৎ এখন জানা হয়েছে) যে, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন (উত্তম ও স্থানোপযোগী) উপমা বর্ণনা করেছেন কালেমায়ে তাইয়্যেবার! (অর্থাৎ কালেমায়ে তওহীদ ও ঈমানের।) এটা একটা পবিত্র বৃক্ষসদৃশ (অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের মত) যার শিকড় দৃঢ়ভাবে (মাটির অভ্যন্তরে) প্রোথিত এবং এ শাখাসমূহ সুউচ্চে উত্থিত। (এবং) সে (অর্থাৎ বৃক্ষ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রতি ঋতুতে (অর্থাৎ যখন তার ফলনের ঋতু আসে) ফল দান করে (অর্থাৎ যথেষ্ট ফলন হয়, কোন ঋতু মার যায় না। এমনিভাবে কলেমায়ে তওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র একটি শিকড় আছে অর্থাৎ বিশ্বাস যা মু'মিনের অন্তরে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এর কিছু ডালপালা রয়েছে অর্থাৎ সৎকর্মসমূহ। ঈমানের পর এগুলো ফলদায়ক হয়। এগুলোকে আকাশপানে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর এগুলোর ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র চিরস্থায়ী সন্তুষ্টির ফল অর্জিত হয়।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা (এধরনের) দৃষ্টান্ত লোকদের (বলার) জন্য এ কারণে বর্ণনা করেন---যাতে তারা (এর উদ্দেশ্যকে) ভালোভাবে বুঝে নেয়। (কেননা, দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য চমৎকার ফুটে উঠে।)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۟ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ
الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ
مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ
دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

(২৬) এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। (২৭) আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, তা করেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ্র নিয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলয়ে (২৯) দোযখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নোংরা কালেমার (অর্থাৎ কালেমায়ে কুফর ও শিরকের) দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি খারাপ বৃক্ষ (অর্থাৎ হান্যল বৃক্ষ), যাকে মাটির উপর থেকেই উৎপাটিত করে নেওয়া হয় (এবং) তার (মাটিতে) কোন স্থায়িত্ব নেই। ('খারাপ' বলা হয়েছে এর গন্ধ, স্বাদ ও রং-এর দিক দিয়ে অথবা এর ফলের গন্ধ, স্বাদ ও রং-এর দিক দিয়ে। এ হচ্ছে خَبِيثَةٍ পবিত্র বিশেষণের বিপরীত। উপর থেকে উৎপাটনের উদ্দেশ্য এই যে, এর শিকড় দূর পর্যন্ত যায় না, উপরে-উপরেই থাকে। এ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ 'শিকড় গভীরে প্রোথিত' এর বিপরীত এবং مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ বাক্যটি এর তাকিদ। এর শাখার ঊর্ধ্বে না যাওয়া এবং এর ফলের খাওয়ার বস্তু হিসাবে কাম্য না হওয়া বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কালেমায়ে কুফরের অবস্থা তদ্রূপই। যদিও কাফিরের অন্তরে এর শিকড় আছে; কিন্তু সত্যের সামনে এর ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরাভূত হয়ে যাওয়া এ অবস্থারই সমতুল্য, যেন এর শিকড়ই নেই। আল্লাহ্ বলেন ঃ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ—সম্ভবত: حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ বলে কুফরের এই ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরাজয় ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কাফিরের সৎকর্ম

আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হয় না। তাই এ বৃক্ষের যেন শাখাও ছড়ায় না। যেহেতু এ সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না, ফল যে হয় না---একথাও স্পষ্টত বোঝা যায়। যেহেতু কাফিরের মধ্যে কবুল ও সন্তুষ্টির মোটেই সম্ভাবনা নেই, তাই খারাপ বৃক্ষের শাখা ও ফলের উল্লেখ নিশ্চিতরূপেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে কুফরের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, এর অস্তিত্ব অনুভবও করা যায় এবং জিহাদ ইত্যাদির বিধি-বিধানে ধর্তব্যও। এ হচ্ছে উভয়ের দৃষ্টান্ত। অতঃপর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মজবুত কথা দ্বারা (অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবার বরকত দ্বারা) পার্থিব জীবনে ও পরকালে (উভয় জায়গায় ধর্মে ও পরীক্ষায়) মজবুত রাখেন এবং (নোংরা কালেমার অশুভ প্রভাবে) জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে উভয় জায়গায়---ধর্মে ও পরীক্ষায়) পথভ্রষ্ট করে দেন এবং (কাউকে মজবুত রাখা ও কাউকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়ার মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে।) আল্লাহ্ তা'আলা (স্বীয় রহস্যের কারণে) যা ইচ্ছা তা করেন। আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি (অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক), যারা নিয়ামতের (শোকরের) পরিবর্তে কুফরী করেছে? (উদ্দেশ্য মক্কার কাফির সম্প্রদায়---দুররে মনসুর) এবং যারা স্বজাতিকে ধ্বংসের গৃহ অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে? (অর্থাৎ তাদেরকেও কুফর শিক্ষা দিয়েছে। ফলে) তারা তাতে (অর্থাৎ জাহান্নামে) প্রবেশ করবে। সেটা মন্দ বাসস্থান। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের প্রবেশ করা স্থায়ী ও চিরকালীন হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্র করে কোন কাজ নিতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যত সৎ হলেও তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

এরপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কাফির ও মু'মিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশপানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়।

এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয় ---সবাই জানে। এর শিকড়সমূহের মাটির গভীর অভ্যন্তরে পৌঁছাও সুবিদিত। এর ফলও সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। বৃক্ষে ফল দেখা দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাট্‌নী, আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় এ ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাণ্ডারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে। সকাল-বিকাল, দিবা-রাত্র, শীত-গ্রীষ্ম---মোটকথা সব সময় ও সব ঋতুতে এটি কাজে আসে। এ বৃক্ষের শাঁসও খাওয়া হয়, এ বৃক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী বস্তুসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এর আঁটি জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য। অন্যান্য বৃক্ষের ফল এরূপ নয়। অন্যান্য বৃক্ষ বিশেষ ঋতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে যায়---সঞ্চয় করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকিম হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কোরআনে উল্লিখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্‌যল (মাকাল) বৃক্ষ। ---(মাযহারী)

মসনদ আহ্‌মদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে একটি প্রশ্ন করলেন ঃ বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মু'মিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি আরও বললেন যে, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন্ বৃক্ষ ? ইবনে ওমর বলেন ঃ আমার মনে চাইল যে, বলে দিই---খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মু'মিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মুকাবিলায় জানমান ও কোন কিছুর পরওয়া করেন নি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ ---এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চ ধাবমান, মু'মিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কোরআন বলে ঃ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ —অর্থাৎ

পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে উঠানো হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন আল্লাহ্ তা'আলার যেসব যিকির, তসবীহ্-তাহ্লীল, তিলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি বস্তু যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, ওঠা-বসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামিল মানুষ এবং আল্লাহ্ ও রসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, تُؤْتِىٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ বাক্যে اُكُل শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حِيْن শব্দের অর্থ প্রতি মুহূর্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারও কারও অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফিরদের দৃষ্টান্ত ঃ এর বিপরীতে কাফিরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ ঈমান, তেমনি কালেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে شَجَرٌ لَا خَبِيْثَةٌ -অর্থাৎ খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন।

কোরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ কোন বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফিরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। এক. কাফিরের ধর্মবিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। দুই. দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তিন. বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ কাফিরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্র দরবারে ফলদায়ক নয়।

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ঃ এরপর মু'মিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ —অর্থাৎ মু'মিনের কালেমায়ে তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মত একটি

প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন---দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মুকাবিলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ 'কবর জগৎ' বোঝানো হয়েছে।

কবরের শাস্তি ও শাস্তি কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কবরে মু'মিনকে প্রশ্ন করার ভয়ংকর মুহূর্তেও সে আল্লাহ্র সমর্থনের বলে এই কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন ঃ আল্লাহ্র বাণী يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ এর উদ্দেশ্য তা-ই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে একই বিষয়-বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় কাব্যপুস্তিকা التثبيت عند التبيت এবং شرح الصدور এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখিরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং এ পরীক্ষায় সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে সওয়াব অথবা আযাব হওয়ার বিষয়টি কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই সওয়াব ও আযাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সেই বস্তুটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জীন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারও দৃষ্টিগোচর হত না; কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে বিষম কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

নীতির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা

নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে পর জগতে পৌঁছার পর এ আযাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালিম অর্থাৎ অস্বীকারকারী কাফির ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তাই করেন। তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায় এরূপ কোন শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে এয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেন ঃ মু'মিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁরা আরও বলেন ঃ যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ-

অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।

এখানে 'আল্লাহ্র নিয়ামত' বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নিয়ামত বোঝান যেতে পারে; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত বিশেষ নিয়ামতসমূহও; যেমন ঐশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রন্থিতে, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হিদায়তের সামগ্রীরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এই উভয় প্রকার নিয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও শক্তি-সামর্থ্য সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু কাফির ও মুশরিকরা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র

মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

বিধান ও নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে তওহীদ ও কলিমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও ফলাফল এবং একে অস্বীকারের অমঙ্গল ও মন্দ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ এমন অক্ষয় ধন যার বরকতে ইহকালে, পরকালে এবং কবরেও আল্লাহ্‌র সমর্থন অর্জিত হয়। একে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহকে আযাবে রূপান্তরিত করারই নামান্তর।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ
اِلَى النَّارِ ۝ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا
مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ
وَلَا خِلٰلٌ ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ
مَاۗءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ
فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَاۗىِٕبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۭ
وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

(৩০) এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ স্থির করেছে, যাতে তারা তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুন ঃ মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩১) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেওয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা -কেনা নাই এবং বন্ধুত্বও নাই। (৩২) তিনিই আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (৩৩) এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। (৩৪)

যে সকল বস্তু তোমারা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ ঃ

এবং (উপরে বলা হয়েছে যে, তারা নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে কুফুরী করেছে এবং নিজ জাতিকে জাহান্নামে পৌঁছিয়েছে। এই কুফরীও পৌঁছানোর বিবরণ এই যে) তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, যাতে (অন্যান্যকেও) তাঁর দীনের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। (সুতরাং অংশীদার সাব্যস্ত করা হচ্ছে কুফর এবং অন্যান্যকে পথচ্যুত করা হচ্ছে জাহান্নামে পৌঁছানো)। আপনি (তাদের সবাইকে) বলে দিন ঃ কিছুদিন মজা উপভোগ করে নাও। কেননা, পরিণামে তোমাদেরকে দোযখে যেতে হবে। (মজা উপভোগের অর্থ কুফুরী অবস্থায় থাকা। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ধর্মমতের মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করে। অর্থাৎ আরও কিছু দিন কুফরী করে নাও। এটা ভীতি প্রদর্শন। কেননা উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তোমাদের জাহান্নামে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাই তোমাদের কুফুরী থেকে বিরত হওয়া কঠিন। যাক, আরও কিছু দিন এভাবেই অতিবাহিত করে নাও। এরপর তো এ বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে। এবং) আমার যেসব ঈমানদার বান্দা আছে (তাদেরকে এ অকৃতজ্ঞতার শাস্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে তা থেকে মুক্ত রাখার জন্য) তাদেরকে বলে দিন ঃ তারা (এভাবে নিয়ামতের শোকর আদায় করুক যে) নামায প্রতিষ্ঠিত করুক এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে (শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী) গোপনে ও প্রকাশ্যে (যখন যেরূপ সুযোগ হয়) ব্যয় করুক, এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় হবে না এবং বন্ধুত্ব হবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুক। এটাই নিয়ামতের শোকর)। তিনিই আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য ফল জাতীয় রিযিক সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকা (ও জাহাজ) কে (স্বীয় শক্তির) অনুবর্তী করেছেন, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে (ও কুদরতে) সমুদ্রে চলাচল করে (এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য হাসিল হয়) এবং তোমাদের উপকারার্থে নদ-নদীকে (স্বীয় শক্তির) অনুবর্তী করেছেন (যাতে তা থেকে পানি পান কর ; জল সেচন কর এবং নৌকা চালাও) এবং তোমাদের উপকারার্থে সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বীয় শক্তির) অনুগামী করেছেন, যারা সদা-সর্বদা চলমানই থাকে, (যাতে তোমাদের আলো, উত্তাপ ইত্যাদির উপকার হয়) এবং তোমাদের উপকারার্থে রাত ও দিনকে (স্বীয় শক্তির) অনুগামী করেছেন (যাতে তোমাদের জীবিকা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা হয়)। এবং যে যে বস্তু তোমরা চেয়েছ (এবং যা তোমাদের উপযোগী হয়েছে) তার প্রত্যেকটি তোমাদেরকে দিয়েছেন। (শুধু উল্লিখিত বস্তু সমূহই কেন) আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত (তো এত অগণিত যে) যদি (এগুলোকে) গণনা কর, তবে গুণতিতেও শেষ করতে পারবে না। (কিন্তু) সত্য এই যে, মানুষ খুব অন্যায়কারী

অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। (তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের কদর ও শোকর করে না; বরং উল্টা কুফর ও পাপকাজে লিপ্ত হয়; যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

(اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইবরাহীমের শুরুতে রিসালত, নবুয়ত ও পরকাল সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ছিল। এরপর তওহীদের ফযীলত, কলেমায়ে কুফর ও শিরকের নিন্দা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা ও কুফরীর পথ বেছে নিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে; দ্বিতীয় আয়াতে মু'মিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্য কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্‌র মহান নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা ঃ اَنْدَاد শব্দটি نِدّ-এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে اَنْدَاد বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। تَمَتُّع শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা সাময়িক ভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে ঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক। তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে ঃ (মক্কার কাফিররা তো আল্লহ্‌র নিয়ামতকে কুফুরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে) আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামায কায়েম করুক এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজেদের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মানদানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামায কায়েম করুক। নামাযের সময়ে অলসতা এবং নামাযের সুষ্ঠু নিয়মাবলীতে ত্রুটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতি বৈধ রাখা হয়েছে----গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোন কোন আলিম বলেন ঃ ফরয যাকাত ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত ---যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত---

যাতে রিয়া ও নাম-যশ অর্জনের মতো মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশংকা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযিলত খতম হয়ে যায়---ফরয হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ এখানে خلال শব্দটি خُلَّةٌ এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধুত্ব। একে باب مفاعلة এর ধাতুও বলা যায়; যেমন دفاع و قتال ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ দু'ব্যক্তি পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায ও সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ্ তা'আলা নামায পড়ার এবং গাফিলতিবশত বিগত যমানার না পড়া নামাযের কাযা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থসম্পদ তোমার করায়ত্ত রয়েছে। একে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যখন এ দু'টি শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামায পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায় ও কোন টাকা-পয়সা থাকবে না, যদ্দ্বারা কারও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোন কেনাবেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় ত্রুটি ও গোনাহের কাফ্ফারার জন্য কোন কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোন কাজে আসবে না। কোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আযাব কোনরূপে হটাতে পারবে না।

'ঐ দিন' বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারও দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাকে না।

বিধান ও নির্দেশ ঃ এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না। কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দীনের কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ أَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ -অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা পরস্পরে বন্ধু ছিল, সেদিন

পরস্পরে শত্রু হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ্‌ভীরুরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো নিয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাই হল যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলো তোমাদের রিযিক হতে পারে। ثمرات শব্দটি ثمر-এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثمر বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ---সবই ثمرات শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত رزق শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে। ---(মাযহারী)

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এক আল্লাহ্‌র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سخر শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব জিনিষের ব্যবহার তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা-লক্কড়, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি---সবই আল্লাহ্ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কর্তার গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা, নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহ্‌র সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরী নয়।

এরপর বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই গতিতে চলাচল করে। دائبين শব্দটি دأب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু'ঘন্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ, রাতের কাজ বেশী। কেউ বলত, দু'ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ, দিনের কাজ বেশী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, ওগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জীর অধীন।

এমনিভাবে রাত ও দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেওয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহ্র দান ও পুরস্কার কারও চাওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন ---

ما نبودیم و تقاضا ما نبود
لطف تو ناگفتهٔ ما می شنود

---'আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন তাকিদও ছিল না। তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা আকাংখা শ্রবণ করেছে।'

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল ? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাযী বায়যাভী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, মানুষ সাধারণত যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ জানেন যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ তা'আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শতশত সূক্ষ্ম, নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদাই কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কুল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নিয়ামত মনে করা হয়, নিয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ প্রত্যেক কষ্ট, প্রত্যেক বিপদ ও প্রত্যেক শোক ও দুঃখ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র নিয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত

হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নিয়ামতের গণনা কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেনঃ الان قد شكرت يا داؤد -অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ -অর্থাৎ মানুষ খুবই জালিম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ। কিন্তু সাধারণত মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহ্কে ভুলে যায়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মু'মিনের গুণ شَكُوْرٌ ও صَبَّارٌ (অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী) ব্যক্ত হয়েছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ
نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ
تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا اِنِّيْ
اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ
رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ
وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَآءِ ﴿٣٥﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ
اِنَّ رَبِّیْ لَسَمِیْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٦﴾ رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۖ
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ
یَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٣٨﴾

(৩৫) যখন ইবরাহীম বললেন ঃ হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (৩৬) হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি ; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনিতো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। আল্লাহ্‌র কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমার দোয়া। (৪১) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (ঐ সময়টিও স্মরণযোগ) যখন ইবরাহীম (আ) (হযরত ইসমাঈল ও হযরত হাজেরাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কার প্রান্তরে এনে রাখার সময় দোয়া করে) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে শান্তির জায়গা করে দিন (অর্থাৎ এর অধিবাসীরা শান্তিতে থাকুক। উদ্দেশ্য, একে হরম করে দিন) এবং আমাকে ও আমার বিশেষ সন্তানদেরকে মূর্তি উপাসনা থেকে (যা এখন মূর্খদের মধ্যে প্রচলিত আছে) দূরে রাখুন (যেমন এ যাবত দূরে রেখেছেন)। হে আমার পালনকর্তা, (আমি মূর্তিদের উপাসনা থেকে দূরে থাকার দোয়া এ জন্য করছি যে) এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। (অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে। এজন্য ভীত হয়ে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি যেমনি সন্তানদেরকে দূরে রাখার দোয়া করি, তেমনি তাদেরকেও উপদেশ দান করতে

থাকব।) অতঃপর (আমার উপদেশ দানের পর) যে আমার পথে চলবে, সে আমার (এবং তার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা আছেই) এবং যে (এ ব্যাপারে) আমার কথা মানবে না, (তাকে আপনি হিদায়ত করুন। কেননা) আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (হিদায়ত দিয়ে তাদের ক্ষমা ও দয়ার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এ দোয়ার উদ্দেশ্য মু'মিনদের জন্য সুপারিশ এবং অমু'মিনদের জন্য হিদায়ত প্রার্থনা।) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজ সন্তানদেরকে (অর্থাৎ ইসমাঈল ও তার মাধ্যমে তার ভাবী বংশধরকে) আপনার পবিত্র গৃহের (অর্থাৎ খানায়ে কা'বার) নিকটে (যা পূর্ব থেকে নির্মিত ছিল এবং মানুষ সর্বদা যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আসছিল) একটি (অপরিসর) প্রান্তরে (যা কংকর-ময় হওয়ার কারণে) চাষাবাদযোগ্য (-ও) নয়, আবাদ করছি। হে আমাদের পালনকর্তা, (পবিত্র গৃহের নিকটে এজন্য আবাদ করছি) যাতে তারা নামাযের (বিশেষ) বন্দোবস্ত করে। (এবং যেহেতু এখন এটা একটা অপরিসর প্রান্তর) অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর এদিকে আকৃষ্ট করে দিন (যেন তারা এখানে এসে বসবাস করে এবং এটি ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যায়।) এবং (যেহেতু এখানে চাষাবাদ নেই; তাই) তাদেরকে (স্বীয় কুদরত বলে) ফল-মূল আহার্য দান করুন---যাতে তারা (এসব নিয়ামতের) শোকর আদায় করে। হে আমাদের পালনকর্তা, (এসব দোয়া একমাত্র নিজের দাসত্ব ও অভাব প্রকাশের জন্য---আপনাকে অভাব সম্পর্কে জ্ঞাত করার জন্য নয়। কেননা) আপনি তো সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, যা আমরা গোপন রাখি এবং যা প্রকাশ করি এবং (আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ই বলব কেন) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে (তো) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কোন কিছুই অপ্রকাশ্য নয়। (আরও কিছু দোয়া পরে উল্লিখিত হবে। মাঝখানে কিছু সংখ্যক সাবেক নিয়ামতের কারণে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাতে কৃতজ্ঞতার বরকতে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাই বলেছেন ঃ) সব প্রশংসা (ও গুণ বর্ণনা) আল্লাহ্র জন্য (শোভা পায়) যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাক (দু'পুত্র) দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী। (অর্থাৎ কবুলকারী। সেমতে সন্তান দান সম্পর্কিত আমার দোয়া رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ কবুল করেছেন। অতঃপর এই নিয়ামতের শোকর আদায় করে অবিশিষ্ট দোয়া পেশ করছেন ঃ) হে আমার পালনকর্তা, (আপনার পবিত্র গৃহের কাছে আমি আমার সন্তানদেরকে আবাদ করেছি। উদ্দেশ্য, তারা নামায কায়েম করুক। আপনি আমার এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। তাদের জন্য নামাযের বন্দোবস্ত করা যেমন আমার কাম্য, তেমনিভাবে নিজের জন্যও কাম্য। তাই নিজের ও তাদের উভয় পক্ষের জন্য দোয়া করছি। যেহেতু আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসীও হবে, তাই দোয়া সবার জন্য করতে পারি না। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোয়া করছি যে) আমাকেও নামায কায়েমকারী রাখুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও কিছু সংখ্যককে

(নামায কায়েমকারী করুন)। হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমার (এই) দোয়া কবুল করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে হিসাব কায়েম হওয়ার দিন। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উল্লিখিত সবাইকে ক্ষমা করুন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং শিরক সংক্রান্ত মূর্খতা ও নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। তওহীদের ব্যাপারে পয়গম্বরগণের মধ্যে সবচাইতে অধিক সফল জিহাদ হযরত ইবরাহীম (আ) করেছিলেন। এ জন্যই ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে বিশেষভাবে 'দীনে-হানীফ' বলা হয়।

এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আরও একটি কারণ এই যে, পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا আয়াতে মক্কার ঐসব কাফিরের নিন্দা করা হয়েছে, যারা পিতৃপুরুষের অনুসরণে ঈমানকে কুফরে এবং তওহীদকে শিরকে রূপান্তরিত করেছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে তাদের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর আকীদা ও আমল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে পিতৃ অনুসরণে অভ্যস্ত কাফিররা এদিকে লক্ষ্য করে কুফর থেকে বিরত হয়। ---(বাহ্‌রে মুহীত)

বলা বাহুল্য, শুধু ইতিহাস বর্ণনা করার লক্ষ্যেই কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের কাহিনী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি, বরং এসব কাহিনীতে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে যেসব মৌলিক দিকনির্দেশ থাকে, সেগুলোকে ভাস্বর রাখার জন্য এসব ঘটনা বারবার কোরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম দোয়া ঃ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا — অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাকারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بَلَدًا শব্দটি الف ও لام ব্যতীত بلد বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোন গোনাহ্ও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে পয়গম্বরগণ সর্বদা শংকা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দোস্তের দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার বরাত দিয়ে ইসমাঈল (আ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেন নি। বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তানদেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহ্র স্মারক হিসাবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করত। এতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না। বরং বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করা যেমন আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তাওয়াফ করাকে আল্লাহ্র ইবাদতের পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ — অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দ কর্ম নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেওয়া হয়, তবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম (আ)-কে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেন নি। একথা

বলেন নি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাফিরও যেন আযাবে পতিত না হয়। "আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু"---একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেন নি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আ)-ও স্বীয় উম্মতের কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন ঃ

وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ----অর্থাৎ আপনি যদি ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান, সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার এ দু'জন মনোনীত পয়গম্বর কাফিরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেন নি। কারণ এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। কিন্তু একথাও বলেন নি যে, কাফিরদের উপর আযাব নাযিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভংগিতে তাদের ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

বিধান ও নির্দেশ ঃ দোয়া প্রত্যেকেই করে কিন্তু দোয়ার সঠিক ঢঙ সবার জানা থাকে না। পয়গম্বরগণের দোয়া শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকে। দোয়ায় কি জিনিস চাওয়া বিধেয় পয়গম্বরগণের দোয়া থেকে তা অনুমান করা যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচ্য দোয়ায় দু'টি অংশ রয়েছে। এক. মক্কা শহরকে ভয় ও আশংকামুক্ত শান্তির আবাসস্থান করা। দুই, স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে চিরতরে মুক্তি দান করানো।

চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দু'টি বিষয়ই হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণের মৌলিক ধারা। কেননা মানুষ যদি বসবাসের জায়গায় ভয়, আশংকা ও শত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্ভাবনামুক্ত হতে না পারে, তবে জাগতিক ও বৈষয়িক এবং ধর্মীয় ও আত্মিক কোন দিক দিয়েই তার জীবন সুখী হতে পারে না। জগতের যাবতীয় কর্ম ও সুখ যে শান্তি ও মানসিক স্থিরতার উপর নির্ভরশীল, একথা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি শত্রুর হামলা ও বিভিন্ন প্রকার বিপদাশংকায় পরিবেষ্টিত থাকে, তার কাছে জগতের বৃহত্তম নিয়ামত, পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণের সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দালান-কোঠা ও বাংলো এবং অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য---সবই তিক্ত বিস্বাদ মনে হতে থাকে।

ধর্মীয় দিক দিয়েও প্রত্যেক ইবাদত ও আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা তখনই সম্ভবপর, যখন মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তির পরিবেশ বিরাজমান থাকে।

তাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম দোয়ায় মানসিক কল্যাণের, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব প্রয়োজন বোঝান হয়েছে। এই একটি মাত্র বাক্য দ্বারা তিনি সন্তান-সন্ততির জন্য দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রার্থনা করেছেন।

এ দোয়া থেকে আরও জানা গেল যে, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের

অর্থনৈতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করাও পিতার অন্যতম কর্তব্য। এর চেষ্টা যুহ্দ তথা দুনিয়ার ভালবাসা বর্জনের পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় দোয়ায়ও অনেক ব্যাপকতা আছে। কেননা, যে পাপের ক্ষমা নেই তা হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। তিনি এ পাপ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া করেছেন। এর পর কোন পাপ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ অন্যান্য আমল দ্বারাও হতে পারে এবং কারও সুপারিশ দ্বারাও মাফ হয়ে যেতে পারে। যদি মূর্তিপূজা শব্দটিকে সূফী বুযুর্গদের ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাপকতর অর্থে ধরা হয়, তবে যে বস্তু মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফিল করে দেয়, তাই তার জন্য মূর্তি বিশেষ এবং এর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে পরাভূত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া তার জন্য পূজা সমতুল্য। অতএব মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত রাখার দোয়ার মধ্যে সর্বপ্রকার পাপ থেকে হিফাযত করার বিষয়বস্তু এসে গেছে। কোন কোন সূফী বুযুর্গ এ অর্থেই নিজের মনকে সম্বোধন করে গোনাহ্ ও গাফিলতির প্রতি ভৎ'সনা করেছেন ঃ

سوده گشت از سجدهٔ راه بتاں پیشانیم
چند بر خود تہمت دین مسلمانی نہم

সাধক রূমী বলেন ঃ پر خیال شہوتے در رہ بتے ست

তৃতীয় আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আরও একটি বিজ্ঞসুলভ দোয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ الآية — হে আমার পালনকর্তা! আমি কিছু সংখ্যক পরিবার-পরিজনকে পাহাড়ের এমন এক পাদদেশে আবাদ করেছি, যেখানে চাষাবাদের সম্ভাবনা নেই (এবং বাহ্যত জীবনধারণের কোন উপকরণ নেই)। পাহাড়ের এ পাদদেশটি আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটে অবস্থিত। এখানে আবাদ করার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা নামায কায়েম করে। এজন্য আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন, যাতে তাদের সম্প্রীতি ও বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তাদেরকে ফল দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়।

ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার একটি পটভূমি আছে। তা এই যে, নূহ (আ)-এর আমলে মহা প্লাবনে কা'বা গৃহের প্রাচীর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর এ পবিত্র ঘর পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজের জন্য মনোনীত করেন, এবং তাকে স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে সিরিয়া থেকে হিজরত করে এই শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপন করার আদেশ দেন।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ইসমাঈল (আ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। ইবরাহীম (আ) আদেশ অনুযায়ী তাঁকে ও তাঁর জননী হাজেরাকে বর্তমান কা'বাগৃহ ও যমযম কূপের অদূরে রেখে দিলেন। তখন এ স্থানটি পাহাড় বেষ্টিত জনশূন্য প্রান্তর ছিল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ও জনবসতির কোন চিহ্ন ছিল না। ইবরাহীম (আ) তাঁদের জন্য একটি পাত্রে কিছু খাদ্য এবং মশকে পানি রেখে দিলেন।

এরপর ইবরাহীম (আ) সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের আদেশ পান। যে জায়গায় আদেশটি লাভ করেন, সেখান থেকেই আদেশ পালন করত রওনা হয়ে যান। স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে জনমানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত পরবর্তী দোয়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্ব করাও সমীচীন মনে করেন নি যে, হাজেরাকে সংবাদ দেবেন এবং কিছু সান্ত্বনার বাক্য বলে যাবেন।

ফলে হযরত হাজেরা যখন তাঁকে যেতে দেখলেন, তখন বারবার ডেকে বললেন, আপনি আমাদেরকে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোন মানুষ এবং না আছে জীবনধারণের কোন উপকরণ। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) পেছনে ফিরে দেখলেন না। সম্ভবত তিনি আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ পেয়েছেন। তাই পুনরায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ্ কি আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন? তখন ইবরাহীম (আ) পেছনে তাকিয়ে উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ। হযরত হাজেরা একথা শুনে বললেন ঃ إِذًا لَا يُضَيِّعَنَا

অর্থাৎ তবে আর কোন চিন্তা নেই। যে মালিক আপনাকে এখান থেকে চলে যওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বিনষ্ট হতে দেবেন না।

হযরত ইবরাহীম (আ) সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন একটি পাহাড়ের পশ্চাতে পৌঁছলেন এবং হাজেরা ও ইসমাঈল দৃষ্টি থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন, তখন বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই দোয়া থেকে অনেক দিক নির্দেশ ও মাস'আলা জানা যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে।

দোয়ায়ে ইবরাহীমীর রহস্যাবলী ঃ (১) ইবরাহীম (আ) একদিকে আল্লাহ্‌র দোস্ত হিসেবে তাঁর যা করণীয় ছিল, তা করেছেন। যখন ও যে স্থানে তিনি সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার আদেশ পান, সেই মুহূর্তে সেই স্থান থেকে শুষ্ক জনমানবহীন প্রান্তরে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে চলে যাওয়ার ব্যাপারে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেননি। এ আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্বও সহ্য করেননি যে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের কথা বলবেন এবং তাঁকে দু'কথা বলে সান্ত্বনা দেবেন। বরং আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি সেখান থেকেই সিরিয়াভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান।

অপরদিকে পরিবার-পরিজন ও তাদের মহব্বতের হক এভাবে পরিশোধ করেছেন যে, পাহাড়ের পশ্চাতে তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়েই আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের হিফাযত ও সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্য দোয়া করেছেন। কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, নির্দেশ পালনের সাথে সাথে যে দোয়া করা হবে, তা দয়াময়ের দরবারে অবশ্যই কবুল হবে, হয়েছেও তাই। এই সহায়হীনা ও অবলা মহিলা এবং তাঁর শিশুপুত্র শুধু নিজেরাই পুনর্বাসিত হন নি; বরং তাঁদের উছিলায় একটি শহর স্থাপিত হয়ে গেছে এবং শুধু তাঁরাই জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পাননি, তাঁদের বরকতে আজ পর্যন্ত মক্কাবাসীদের উপর সর্বপ্রকার নিয়ামতের দ্বার অবারিত রয়েছে।

এ হচ্ছে পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সুব্যবস্থা। এখানে এক দিকে লক্ষ্য দেওয়ার সময় অন্যদিক উপেক্ষিত হতো না। পয়গম্বরগণ সাধারণ সূফী-বুযুর্গদের মত ভাবাবেগে হারিয়ে যেতেন না। এ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ যথার্থ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

(২) হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তাঁর জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি সিরিয়া চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ্ তাঁদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্য পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ার بِوَادٍ غَيْرِ ذِي مَاءٍ (জলহীন প্রান্তরে) বলেন নি; غَيْرِ ذِي زَرْعٍ (চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুষ্কর।---(বাহ্‌রে-মুহীত)

(৩) عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাক্বারার তফসীরে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করেন। তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মু'জিযা হিসেবে সরন্দ্বীপ পাহাড় থেকে এখানে পৌঁছানো হয় এবং জিবরায়ীল বায়তুল্লাহ্‌র জায়গা চিহ্নিতও করে দেন। আদম (আ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চতুষ্পার্শ প্রদক্ষিণ করতেন। শেষ পর্যন্ত নূহের মহাপ্লাবনের সময় বায়তুল্লাহ্ উঠিয়ে নেওয়া হয়; কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ্ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়। হযরত জিবরায়ীল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আ) নির্মিত এই প্রাচীর মূর্খতা-যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরায়শরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণ-কাজে আবু তালিবের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)ও নবুয়তের পূর্বে অংশগ্রহণ করেন।

এতে বায়তুল্লাহ্‌র বিশেষণ مُحَرَّم উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ্ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণ বিদ্যমান আছে। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত।

(৪) لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ—হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়ার প্রারম্ভে পুত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামায কায়েমকারী করার দোয়া করেন। কেননা, নামায দ্বারা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাযের অনুবর্তী করে দেয় তবে এটাই

সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্বরূহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষা হবে। ইবরাহীম (আ) যদিও সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়ে ছিলেন; কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন।

(৫) فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ শব্দটি أفئدة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে أفئدة শব্দটি نكرة এবং তার সাথে من অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تقليل ও تبعيض এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত; أفئدة الناس বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, খৃস্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) দোয়ায় বলেছেন ঃ কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

(৬) وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ ثمرات শব্দটি ثمرة এর বহুবচন। এর অর্থ ফল, যা স্বভাবত খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

ثمرة শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর ফলাফলকে তার ثمرة বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ثمرة বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। চাকুরী ও মজুরির ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর ثمرة কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ বলা হয়েছে। এতে شجر শব্দ ব্যবহার না করে شيء (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অর্জিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন। সম্ভবত এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

(৭) হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের জন্য এরূপ দোয়া করেন নি যে, মক্কার ভূমিকে চাষাবাদযোগ্য করে দিন। এরূপ করলে মক্কার উপত্যকাকে শস্য-শ্যামলা করে

দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু তিনি সন্তানদের জন্য কৃষিবৃত্তি পছন্দ করেন নি। তাই কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন যাতে তারা পূর্ব-পশ্চিম ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আগমন করে এবং তাদের এ সমাবেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়েত ও মক্কাবাসীদের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এই দোয়া কবুল করেছেন। ফলে মক্কার অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত চাষাবাদ ও কৃষিকাজের মুখাপেক্ষী না হয়েও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্রের অধিকারী হয়ে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করছে।

(৮) لعلهم يشكرون — এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার ওপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে ربنا শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'অন্তরগত অবস্থা' বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং হাজেরার ঐসব বাক্য বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি আরও বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোন বস্তু ই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ ط

اِنَّ رَبِّیْ لَسَمِیْعُ الدُّعَاءِ—এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম (আ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামতের শোকর আদায় করেছেন। নিয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে দান করেছেন।

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন। অবশেষে اِنَّ رَبِّیْ لَسَمِیْعُ الدُّعَاءِ—বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান ঃ رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ

الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ—এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য নামায কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন ঃ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ

وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ—অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

এতে তিনি মাতাপিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফির ছিল, তা কোরআন পাকেই উল্লিখিত আছে। সম্ভবত এ দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আ)-কে কাফিরদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে ঃ

وَاغْفِرْ لِاَبِیْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّیْنَ ۝

বিধান ও নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে দোয়ার যথাবিহিত পদ্ধতি জানা গেল যে, বারবার কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দন সহকারে দোয়া করা চাই এবং সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা চাই। এভাবে প্রবল আশা করা যায় যে, দোয়া কবুল হবে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ
طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۝ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ
الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ
دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۭ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ
زَوَالٍ ۝ وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ
وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ۭ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝
فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝
سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ
كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ هٰذَا بَلٰغٌ
لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ
اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

(৪২) জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্কে কখনও বেখবর মনে করো না। তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে।

(৪৩) তারা মস্তক উপরে তুলে ভীতি-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে। (৪৪) মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? (৪৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেওয়ার মত হবে না। (৪৭) অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি ধারণা করোনা যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র সামনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে অগ্নিতে ঢেকে নিবে। (৫১) যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই---একক ; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা) যা কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাকে (দ্রুত আযাব না দেওয়ার কারণে) বেখবর মনে করো না। কেননা, তাদেরকে শুধু ঐদিন পর্যন্ত সময় দিয়ে রেখেছেন, যেদিন তাদের নেত্রসমূহ (বিস্ময় ও ভয়ের আতিশয্যে) বিস্ফারিত হয়ে যাবে (এবং তারা হিসাবের ময়দানের দিকে তলব অনুযায়ী) ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকবে (এবং) তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ অনিমেষ নেত্রে সামনে তাকিয়ে থাকবে) এবং তাদের অন্তরসমূহ (ভীষণ আতংকে) অত্যন্ত ব্যাকুল হবে এবং (সেদিন এসে গেলে কাউকে সময় দেওয়া হবে না। অতএব) আপনি তাদেরকে ঐদিনের (আগমনের) ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে যাবে। অতঃপর জালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত আমাদেরকে (আরও) সময় দিন (এবং দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরণ করুন) আমরা (এই সময়ের মধ্যে) আপনার সব কথা মেনে নেব এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করব। (উত্তরে বলা হবে ঃ আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সময় দেইনি এবং) তোমরা কি (এ দীর্ঘ সময়ের কারণেই) ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) কসম খাওনি যে, তোমাদেরকে (দুনিয়া থেকে) কোথাও যেতে হবে না? (অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলে এবং

এজন্য কসম খেতে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ অথচ) অবিশ্বাস থেকে বিরত হওয়ার যাবতীয় কারণ উপস্থিত ছিল। সেমতে তোমরা ঐ (পূর্ববর্তী) লোকদের বাসস্থানে বাস করতে, যারা (কুফর ও কিয়ামত অস্বীকার করে) নিজেদের ক্ষতি করেছিল এবং তোমরা (সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে) একথাও জানতে যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম। (অর্থাৎ কুফরী ও অস্বীকারের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। এ থেকে তোমরা জানতে পারতে যে, অস্বীকার করা গযবের কারণ। সুতরাং স্বীকার করে নেওয়া অপরিহার্য। তাদের বাসস্থানে বাস করা সর্বদা তাদের এসব অবস্থা স্মরণ করানোর কারণ হতে পারত। সুতরাং অস্বীকারের অবকাশ মোটেই ছিল না।) এবং এসব ঘটনা শোনা ছাড়াও সেগুলো (শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল) আমি (ও) তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। (অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থসমূহে আমিও এসব ঘটনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছি যে, যদি তোমরা এরূপ কর তবে তোমরাও গযবে পতিত ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। অতএব প্রথমে সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে ঘটনাবলী শোনা, অতঃপর আমার বর্ণনা, অতঃপর দৃষ্টান্ত, অতঃপর হুঁশিয়ার করা---এত সব কারণের উপস্থিতিতে তোমরা কিরূপে কিয়ামত অস্বীকার করলে?) এবং (আমি পূর্ববর্তী যেসব লোককে কুফরী ও অস্বীকারের কারণে শাস্তি দিয়েছি,) তারা (সত্যধর্ম বিলোপ করার কাজে) নিজেদের সাধ্যানুযায়ী বড় বড় কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল এবং তাদের (এসব) কূটকৌশল আল্লাহ্র সামনে ছিল। (তাঁর জ্ঞানের পরিধির বাইরে ছিল না---থাকতে পারত না।) এবং বাস্তবিকই তাদের কূটকৌশল এমন ছিল যে, তদ্দ্বারা পাহাড়ও (স্বস্থান থেকে) হটে যায়। (কিন্তু এতদসত্ত্বেও সত্যের জয় হয়েছে এবং তাদের সব কূটকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিপাত হয়েছে। এ থেকেও জানা গেল যে, পয়গম্বর যা বলেন তাই সত্য এবং তা অস্বীকার করা আযাব ও গযবের কারণ। যখন কিয়ামতে তাদের পর্যুদস্ত হওয়া জানা গেল,) অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) আল্লাহ্ তা'আলাকে পয়গম্বরগণের সাথে ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে করো না। (সেমতে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে ওয়াদা ছিল তা পূর্ণ হবে; যেমন উপরে বলা হয়েছে) নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, (এবং) প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁকে কেউ বিরত করতে পারে না। সুতরাং শক্তিও অপার, এরপর ইচ্ছার সম্পর্ক উপরে জানা গেল। এমতাবস্থায় ওয়াদা ভঙ্গ করার আশংকা কোথায়? এ প্রতিশোধ ঐ দিন নেবেন,) যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হবে এই পৃথিবী ছাড়া এবং আকাশও (পরিবর্তিত হয়ে অন্য আকাশ হবে এসব আকাশ ছাড়া। কেননা, প্রথমবার শিঙ্গা ফুঁকার কারণে সব ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যাবে। এরপর পুনর্বার নতুনভাবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজিত হবে) এবং সবাই এক (ও) পরাক্রমশীল আল্লাহ্র সামনে পেশ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এই দিন প্রতিশোধ নেওয়া হবে।) এবং (ঐদিন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি অপরাধীদেরকে

(অর্থাৎ কাফিরদেরকে) শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখবে (এবং) তাদের জামা কাতেরানের হবে। (অর্থাৎ সারা দেহ কাতেরান জড়ানো থাকবে, যাতে দ্রুত আগুন লাগে। 'কাতেরান' এক প্রকার বৃক্ষ নিসৃত তৈল; মতান্তরে আলকাতরা বা গন্ধক।) এবং আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে (ও) আবৃত করবে; (এসব এজন্য হবে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক (অপরাধী) ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেন। (এরূপ অপরাধী অগণিত হবে, কিন্তু) নিশ্চয় আল্লাহ্ (-র জন্য তাদের হিসাব-কিতাব নেওয়া মোটেই কঠিন নয়; কেননা তিনি) দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সবার বিচার আরম্ভ করে তৎক্ষণাৎ শেষ করে দেবেন।) এটা (কোরআন) মানুষের জন্য বিধি-বিধানের সংবাদনামা (যাতে প্রচারক অর্থাৎ রসূলকে স্বীকার করে) এবং যাতে এর সাহায্যে (শাস্তির) ভয় প্রদর্শন করা হয় এবং যাতে বিশ্বাস করে যে, তিনিই এক উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইবরাহীমে পয়গম্বর ও তাঁদের সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অবস্থার বিবরণ, আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণকারীদের অশুভ পরিণাম এবং সবশেষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচনা ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ্ পুনর্নির্মাণ করেন, তাঁর সন্তানদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা মুকাররমায় জনবসতি স্থাপন করেন এবং এর অধিবাসীদের সর্বপ্রকার সুখ, শান্তি ও অসাধারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তাঁরই সন্তান-সন্ততি বনী-ইসরাইল পবিত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সর্ব প্রথম সম্বোধিত সম্প্রদায়।

সূরা ইবরাহীমের আলোচ্য এ সর্বশেষ রুকূতে সার-সংক্ষেপ হিসেবে মক্কাবাসী-দেরকেই পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ইতিবৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এখনও চৈতন্যোদয় না হওয়ার অবস্থায় কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও প্রত্যেক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং জালিমকে কঠোর আযাবের সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবকাশ দিয়েছেন দেখে জালিম ও অপরাধীদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাদের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত নন; বরং তারা যা কিছু করছে, সব আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু তিনি দয়া ও রহস্যের তাগিদে অবকাশ দিচ্ছেন।

لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا—অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ্কে গাফিল মনে করো না। এখানে বাহ্যত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফিলদেরকে শোনানো এবং হুঁশিয়ার করা। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, জালিমদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসা তাদের জন্য তেমন শুভ নয়। কারণ, এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিয়ামত ও পরকালের আযাবে ধৃত হয়ে যাবে। অতঃপর সূরায় শেষ পর্যন্ত পরকালের আযাবের বিবরণ এবং ভয়াবহ দৃশ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ---অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ --অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ—অর্থাৎ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ—তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালিম ও অপরাধীরা অপারক হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে বলা হবে ঃ এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ○

এতে বাহ্যত আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে وَأَنْذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশদাতা। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু

অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হল না।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ---অর্থাৎ তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্য সাধ্যমত কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মুকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে ; কিন্তু আল্লাহ্র অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণত নমরুদ, ফেরাউন, কওমে-আদ, কওমে-সামুদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুকাবিলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ বাক্যের ان শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে ; কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 'পাহাড়' বলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফিরদের কোন চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ---অর্থাৎ কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খিলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়গম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ---অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেওয়া হবে ; যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا --অর্থাৎ গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না ; বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণত এই পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এই আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথা জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রং হবে রৌপ্যের মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহ্ বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মসনদে-আহমদে ও তফসীরে ইবনে জরীরে উল্লিখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। ---(মাযহারী)

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানব-জাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কোন বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেওয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেইভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এই পৃথিবীতে জমায়েত

হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তাঁর দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সিজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব-কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সত্তার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে।

বয়ানুল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) বলেন ঃ এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুঁকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তফসীর মাযহারীতে মসনদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরামার উক্তি বর্ণিত আছে, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই ঃ এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল ঃ যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে ? তিনি বললেন ঃ পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এমর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ ছাড়া বান্দার উপায় নাই যে,

زبان تازه کردن باقرار تو
نینگیختن علت از کار تو

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতরার। এটি একটি দ্রুত অগ্নিগ্রাহী পদার্থ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হুঁশিয়ার করা, যাতে তারা এখনও বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও শিরক থেকে বিরত হয়।

سورة حجر

সূরা হিজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ ॥ আয়াত ঃ ৯৯ ॥ রুকূ ঃ ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝ ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ
مَّعْلُوْمٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আলিফ-লাম-রা ; এগুলো কিতাব ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত। (২) কোন সময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত! (৩) আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। (৪) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল। (৫) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যায় না এবং পশ্চাতে থাকে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-রা (-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত (অর্থাৎ এর দুই-ই গুণ রয়েছে---পরিপূর্ণ গ্রন্থ হওয়াও এবং সুস্পষ্ট কোরআন হওয়াও। এ বাক্য দ্বারা কোরআন যে সত্য কালাম, তা প্রকাশ করার পর তাদের আক্ষেপ ও আযাব বর্ণিত হয়েছে, যারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না অথবা এর নির্দেশাবলী পালন করে না। বলা হয়েছে رُبَمَا يَوَدُّ অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে যখন নানা রকম আযাবে পতিত হবে, তখন) কাফিররা বারবার

আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা (দুনিয়াতে) মুসলমান হত! (বারবার এজন্য যে, যখনই কোন নতুন বিপদ দেখবে, তখনই মুসলমান না হওয়ার আক্ষেপ নতুন হতে থাকবে।) আপনি (দুনিয়াতে তাদের কুফরীর কারণে দুঃখ করবেন না এবং) তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন---তারা খুব খেয়ে নিক, ভোগ করে নিক এবং কল্পিত আশা তাদেরকে গাফিল করে রাখুক। তারা অতি সত্বর (মৃত্যুর সাথে সাথেই) প্রকৃত সত্য জেনে নিবে। (দুনিয়াতে তারা যে কুফর ও কুকর্মের তাৎক্ষণিক শাস্তি পায় না, এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শাস্তির সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সে সময় এখনও আসেনি।) এবং আমি যতগুলো জনপদ (কুফরীর কারণে) ধ্বংস করেছি, তাদের সবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় লিখিত থাকত এবং (আমার নীতি এই যে,) কোন উম্মত তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ধ্বংস হয়নি এবং পেছনে থাকেনি। (বরং নির্দিষ্ট সময় ধ্বংস হয়েছে। এমনিভাবে তাদের সময় যখন এসে যাবে, তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا—থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফিরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মু'মিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ চারটি বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ঃ চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ গোনাহ্র কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা), কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া।---(কুরতুবী)

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। --(কুরতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবুদ্দারদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ দামেশকবাসিগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্র করেছিল। সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল

এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল। আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদি জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হয়?

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়।---(কুরতুবী)

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝ لَوْ مَا
تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ
اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝

(৬) তারা বলল ঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। (৭) যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালার জন্যই নাযিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(اِلَّا بِالْحَقِّ এ— حق বলে আযাবের ফয়সালা বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন অথবা রিসালাত বুঝানো হয়েছে। বয়ানুল কোরআনে প্রথম অর্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ অর্থটি হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত আছে। আয়াতের তফসীর এই ঃ)

এবং (মক্কার) কাফিররা (রসূলুল্লাহ্ [সা]-কে) বলল ঃ হে ঐ ব্যক্তি, যার উপর (তার দাবী অনুযায়ী) কোরআন নাযিল করা হয়েছে, আপনি (নাউযুবিল্লাহ) একজন উন্মাদ (এবং নবুয়তের মিথ্যা দাবী করেন। নতুবা) যদি আপনি (এ দাবীতে সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (যারা আমাদের সামনে আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا — আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দেন ঃ) আমি ফেরেশতাদেরকে

(যেভাবে তারা চায়,) একমাত্র ফয়সালার জন্যই নাযিল করি এবং (যদি এমন হত) তখন তাদেরকে সময়ও দেওয়া হত না। বরং যখন তাদের আগমনের পরও বিশ্বাস স্থাপন করত না, যেমন তাদের অবস্থাদৃষ্টে এটা নিশ্চিত, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত; যেমন সূরা আন'আমের প্রথম রুকূর শেষ আয়াতগুলোতে এর কারণ বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(৯) আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি কোরআন অবতারণ করেছি এবং (এটা প্রমাণহীন দাবী নয়; বরং এর অলৌকিকত্ব এর প্রমাণ। কোরআনের একটি অলৌকিকত্বের বর্ণনা অন্যান্য সূরায় দেওয়া হয়েছে যে, কোন মানুষ এর একটি সূরার অনুরূপ রচনা করতে পারে না। দ্বিতীয় অলৌকিকত্ব এই যে,) আমি এর (কোরআনের) সংরক্ষক (ও পরিদর্শক। এতে কেউ বেশ-কম করতে পারে না, যেমন অন্যান্য গ্রন্থে করা হয়েছে। এটা এমন একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা যা সাধারণ ও বিশেষ নির্বিশেষে সবাই বুঝতে পারে। মু'জিযা এই যে, কোরআনের বিশুদ্ধতা, ভাষালংকার ও সর্বব্যাপকতার মুকাবিলা কেউ করতে পারে না। এ মু'জিযাটি একমাত্র জ্ঞানী ও বিদ্বান্‌রাই বুঝতে পারে। কিন্তু কমবেশী না হওয়ার ব্যাপারটিকে তো একজন অশিক্ষিত মূর্খও দেখতে পারে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা ঃ ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলীফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের জন্য অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল। সে আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিক দিয়েও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞসুলভ। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি ইহুদী? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন ঃ আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান, তবে আপনার সাথে চমৎকার ব্যবহার করব।

সে উত্তরে বলল ঃ আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন ঃ আপনি

কি ঐ ব্যক্তিই, যে বিগত বছর এসেছিল? সে বলল: হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই। মামুন জিজ্ঞেস করলেন: তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল: এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খৃস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খৃস্টানরা খুব খাতির-যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায় আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম। এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম! এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যেই দেখল, সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কিনা, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশকম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকতাম বলেন: ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলিম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ্-ইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন: কোরআনের কোন আয়াতে আছে? সুফিয়ান বললেন: কোরআনে পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে:

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ — ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের হিফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদী ও খৃস্টানরা হিফাযতের কর্তব্য পালন করেননি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: إِنَّا لَهُ

لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এর হিফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও জবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রিসালতের আমলের পর আজ চৌদ্দ'শ বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন পাক

মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের পূর্বে ও পশ্চিমে পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক-বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলিমেরও সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

হাদীস সংরক্ষণ ও কোরআন সংরক্ষণের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত ঃ বিদ্বান্ মাত্রেই এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন শুধু কোরআনী শব্দাবলীর নাম নয় এবং শুধু অর্থসম্ভারও কোরআন নয়; বরং শব্দাবলী ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়। কারণ এই যে, কোরআনের অর্থসম্ভার এবং বিষয়বস্তু তো অন্যান্য গ্রন্থেও বিদ্যমান আছে। বলতে কি, ইসলামী গ্রন্থাবলীতে সাধারণত কোরআনী বিষয়বস্তুই থাকে। তাই বলে এগুলোকে কোরআন বলা হয় না। কেননা, এগুলোতে কোরআনের শব্দাবলী থাকে না। এমনিভাবে যদি কেউ কোরআনের বিচ্ছিন্ন শব্দ ও বাক্যাবলী নিয়ে একটি রচনা অথবা পুস্তিকা লিখে দেয়, তবে একেও কোরআন বলা হবে না; যদি এতে একটি শব্দও কোরআনের বাইরের না থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন শুধুমাত্র ঐ আল্লাহ্র মসহাফ তথা গ্রন্থকেই বলা হয়, যার শব্দাবলী ও অর্থ সম্ভার একসাথে সংরক্ষিত রয়েছে।

এ থেকে এ মাস'আলাটিও জানা গেল যে, উর্দু, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় কোরআনের শুধু অনুবাদ প্রকাশ করে তাকে উর্দু অথবা ইংরেজি কোরআন নাম দেওয়ার যে প্রবণতা প্রচলিত রয়েছে, এটা কিছুতেই জায়েয নয়। কেননা এটা কোরআন নয়। যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, কোরআন শুধু শব্দাবলীর নাম নয় বরং অর্থসম্ভারও এর একটি অংশ, তখন আলোচ্য আয়াতে কোরআন সংরক্ষণের অনুরূপ অর্থসম্ভার সংরক্ষণ তথা কোরআনকে যাবতীয় অর্থগত পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্বও আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, কোরআনের অর্থসম্ভার তা-ই, যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হয়েছেন। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ আপনাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আপনি লোকদেরকে ঐ কালামের মর্ম বলে দেন, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই ঃ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে বলেছেন ঃ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا অর্থাৎ আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন কোরআনের অর্থ বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তখন তিনি উম্মতকে যেসব উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, সেসব উক্তি ও কর্মের নামই হাদীস।

যে ব্যক্তি রসূলের হাদীসকে ঢালাওভাবে অরক্ষিত বলে, প্রকৃতপক্ষে সে কোরআনকেই অরক্ষিত বলে : আজকাল কিছুসংখ্যক লোক সাধারণ মানুষের মধ্যে এধরনের একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট যে, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সময়কালের অনেক পরে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে।

প্রথমত তাদের এরূপ বলাও শুদ্ধ নয়। কেননা হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলদারীতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা লাভ করেছে মাত্র। এছাড়া হাদীস প্রকৃতপক্ষে কোরআনের তফসীর ও যথার্থ মর্ম। এর সংরক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভব যে, কোরআনের শুধু শব্দাবলী সংরক্ষিত থাকবে আর অর্থসম্ভার (অর্থাৎ হাদীস) বিনষ্ট হয়ে যাবে?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن
رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا
مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ
أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

---

(১০) আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি। (১১) ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেন নি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকেনি। (১২) এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। (১৩) ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে (১৫) তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না----বরং আমরা জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

শব্দার্থ : شِيَعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কারও অনুসারী ও সাহায্যকারী। বিশেষ বিশ্বাস ও মতবাদে ঐকমত্য পোষণকারী সম্প্রদায়কেও-شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি। এখানে الى অব্যয়ের পরিবর্তে فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তাঁর ওপর আস্থা রাখা লোকদের পক্ষে সহজ হয় এবং রসূল ও তাদের স্বভাব ও মেজায সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল হয়ে তাদের সংশোধনের যথোপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ, আপনি তাদের মিথ্যারোপের কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা পয়গম্বরগণের সাথে এরূপ আচরণ চিরকাল থেকেই হয়ে আসছে। সেমতে) আমি আপনার পূর্বেও পয়গম্বরগণকে পূর্ববর্তী লোকদের অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রেরণ করেছিলাম এবং ওদের অবস্থা ছিল এই যে) ওদের কাছে এরূপ কোন রসূল আগমন করেন নি যাঁর সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করেনি। (এটা মিথ্যারোপের জঘন্যতম রূপ। সুতরাং তাদের অন্তরে যেমন ঠাট্টাবিদ্রূপ সৃষ্টি হয়েছিল) এমনিভাবে আমি এ ঠাট্টাবিদ্রূপের প্রেরণা এই অপরাধীদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অন্তরেও সৃষ্টি করে দিয়েছি, (যদ্দরুন) ওরা কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে না আর এ রীতি (নতুন নয়) পূর্ববর্তীদের থেকেই চলে আসছে (যে, তারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করে এসেছে। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন না।) এবং (ওদের হঠকারিতা এরূপ যে, আকাশ থেকে ফেরেশতাদের আগমন তো দূরের কথা, এ থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে) যদি (স্বয়ং ওদেরকে আকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এভাবে যে) আমি ওদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দেই; অতঃপর ওরা দিনভর (যখন তন্দ্রা ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে না) তা দিয়ে (অর্থাৎ দরজা দিয়ে) আকাশে আরোহণ করে, তবুও বলবে যে, আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে। (ফলে আমরা নিজেদেরকে আকাশে আরোহণরত দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু বাস্তবে আরোহণ করছি না। পরন্তু দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর ব্যাপারে শুধু এ ঘটনার কথাই বলি কেন) বরং আমাদেরকে তো পুরোপুরি জাদু করা হয়েছে। (যদি এর চাইতেও বড় কোন মু'জিযা আমাদেরকে দেখানো হয়, তাও বাস্তবে মু'জিযা হবে না।)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

(১৬) **নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি।**

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও বিদ্বেষের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াত ও পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান, শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, নভো-মণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সৃষ্ট-বস্তুর চাক্ষুষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় থাকে না। বলা হয়েছে ঃ) নিশ্চয় আকাশে বড় বড়

নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য আকাশকে (নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা) সুশোভিত করে দিয়েছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بروج শব্দটি برج এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ্, আবু সালেহ্ প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে بروج এর তফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'আকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বোঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিক কালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগোত্র এবং আকাশের অনেক নিচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল---এই উভয় অর্থে سماء শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত। কোরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে سماء শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত এর চূড়ান্ত আলোচনা কোরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ্ সূরা ফোরকানের আয়াত تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا الخ এর তফসীরে করা হবে।

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾

(১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি। (১৮) কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায় তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আকাশকে (নক্ষত্রপুঞ্জের সাহায্যে) প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি (অর্থাৎ ওরা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না) কিন্তু যে কেউ (ফেরেশতাদের) কোন কথা চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। (এবং এর প্রভাবে চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত উল্লিখিত শয়তান ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কিংবা দিশেহারা হয়ে যায়)।